একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Premendra Mitra's Short-stories: Unraveling the mystery of the forest of the heart

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প: হৃদয় অরণ্যের রহস্য উন্মোচন

Name of the Author: **Dipa Ghosh**

Affiliation: **Independent Researcher, West Bengal, India**

Abstract: Premendra Mitra has revealed the secrets of the lower middle class people's hearts by revealing the nature of life's breakdown and disintegration in his stories. For example, the story 'Shudhu Kerani' depicts the daily struggles of a poor clerk. At a time when there is a lot of emotion for a new couple, despair descends into the life of this poor clerk. In the story 'srinkhol', we see that Binati and Bhupati's relationship is that of husband and wife. But, relationship is not as it should be between husband and wife. They have lived together for seven years, but, identity is not in their use, there is a gap between them like an infinite continent.'Telena pota abishkar'(The discovery of the telenapota) '- in the story, see a picture of hesitate, conflict, and even sick thinking. 'Sansar Simanta' - so called The lower class of society in the fiction. Either love between two men and women of the lower class, they can start a new life by relying on each other, even if they want to, their dreams and promises cannot take shape in reality in a social way due to the cruel mockery of GOD. Of course, in the stories discussed in the main article,The skill with which Premendra Mitra skillfully Unrevealed the mysteries of the human heart has been highlighted.

Key word: Premendra Mitra , Sudhu kerani ('only clerk'), Punnam, Srinkhal,Telenapota Abishkar (Discovery of Telenapota), Sansar Simante (Family on the Border)

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প: হৃদয় অরণ্যের রহস্য উন্মোচন

দীপা ঘোষ

"আজ,
বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে,
কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর;
আর কাঁদে পাতকীর বুকে
ভগবান প্রেমের কাঙ্গাল।"[১]

এমন অনুভূতি যাঁর লেখনিতে ধরা দিয়েছে তিনি একাধারে কবি, বিজ্ঞানমনস্ক গল্পকার ও উপন্যাসিক। ফলত তাঁর তিন সত্তার উপলব্ধি তথা যাপনে মানুষের হৃদয়অরণ্যের জটিল কুৎসিত ছবিগুলি ধরা পড়েছে স্বচ্ছভাবে, তিনি হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা যে ছোটগল্পের সার্থক সূচনা ঘটেছিল প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই ধারাপথে স্বতন্ত্রতা দেখিয়ে শরৎচন্দ্রের মতো মানুষকে গভীরভাবে ভালোবেসে তাদের অস্থি-মজ্জায় অনুভব করে তাদের রং বেরঙের চারিত্রিক ছবির ওপর যেন টিউব লাইট জ্বেলে ধরলেন। আর সেই আলোয় সেকালের মানুষের হৃদয় তথা সমকালের মানুষের হৃদয়অরণ্যের ছবিও স্পষ্ট হয়ে উঠে এল। একটি কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন –

"রক্ত, মাংস, হাড়, মেদমজ্জা,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসাসমেত –
গোটা মানুষের মানে চাই।"[২]

গোটা মানুষের মানে খুঁজতে খুঁজতে মানুষের মন পড়তে পড়তে তিনি মানুষের হৃদয় অরণ্যের রহস্য উন্মোচন করেন। হতভাগ্য, নগণ্য বঞ্চিত মানুষের জন্য তাঁর শিল্পীসত্তার অন্তর্গূঢ় সমবেদনা ফুটে উঠেছে তাঁর গল্পে। যুগপরিবেশে বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত মূল্যবোধহীন, সংশয়, হতাশায় দীর্ণ সমকালের জীবনের তাৎপর্য অন্বেষণ করেছেন তিনি। হতভাগ্য মানুষের ভাঙাচোরা জীবনের সাদা-কালো ছবি দেখেছেন বলেই জীবনের তথা মধ্যবিত্তের মানবিকতার হৃদয় অরণ্যের রহস্য সন্ধানে এতো ব্যাকুল তিনি। এপ্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন –

> "প্রেমেন্দ্র মিত্র আবেগের শিল্পী নন, মননের শিল্পী। জীবনের নিছক রূপকার নন, মর্মভেদী বিশ্লেষক। তিনি বস্তুনিষ্ঠ শিল্পী জীবনের ভাঙন ও অরণ্যের স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর লেখনী অকম্পিত, আবার জীবনের জটিলতার বিশ্লেষণে নিপুণ ব্যবচ্ছেদক।"[৩]

প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনের ভাঙন ও অবক্ষয়ের স্বরূপ উন্মোচন করে নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের হৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত করেছেন তাঁর গল্পগুলিতে। বর্তমানে আমরা তাঁর গল্পগুলিতে তিনি কীভাবে সেই হৃদয় অরণ্যের রহস্য

উন্মোচন করেছেন সেগুলি আলোচনা করব। আলোচনার সুবিধার্থে আমি যে গল্পগুলি নির্বাচন করেছি তা পরপর ব্যাখ্যা করছি।

'শুধু কেরানী' গল্পে রয়েছে দরিদ্র কেরানী জীবনের প্রতিদিনকার খুড়িয়ে-চলার ছবি। যে সময়টা একটা নতুন দম্পতির কাছে অনেক আবেগের, অনেক স্বপ্ন ছড়িয়ে থাকে, সেই সময়েই এই দরিদ্র কেরানী জীবনে নেমে আসে হতাশা। এই কেরানী দম্পতি খুবই সাধারণ। তারা প্রতিদিনকার সংসারে অল্প আয়ে নিজেদের মতন সুখ খুঁজে নেয়। ছেলেটি ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে ফুলের মালা কিনে আনে, মেয়েটি ছেলেটির কষ্ট করে আনা ফুলের মালা খোঁপায় পরে, এভাবেই কষ্টের মধ্যে সুখ খুঁজে তারা একে অপরের অবলম্বন হয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। একদিন তাদের সংসারে একটি অচেনা অথিতির সমাগম হয় এই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনে নেমে আসে দুঃখ মেয়েটির সূতিকা রোগ হয়। ছেলেটি জানে মেয়েটি আর বাঁচবে না, তাও তাদের একে অপরের সেই কথা কেউ প্রকাশ করেনি। মেয়েটিও জানে সে আর বাঁচবে না তবুও অভিনয় করে প্রফুল্ল মুখ দেখিয়ে বলে –

"তুমি ভাবছ কেন, আমিত শীগরীরই সেরে উঠছি।"[৪]

ছেলেটি বলে – "কই, আমি ভাবিনে ত; সেরে উঠবে না ত কি,

নিশ্চয় উঠবে।"[৫]

এভাবেই অভিনয় করে তাদের দিন চলে, ছেলেটি ট্রামের টাকা বাঁচিয়ে একদিন ফুলের মালা কিনে এনেছিল। এখন সেই ট্রামের বাঁচানো টাকা দিয়ে হেটে আসে সে স্ত্রীর অসুখের খরচ যোগানোর জন্য, তবু তারা সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে জানে না, মিথ্যা ছলনা অবলম্বন করে তারা বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু তাদের সব স্বপ্ন, তাদের একটা একটা খড় দিয়ে বাঁধা নীড় ভেঙে খান-খান হয়ে যায়, মেয়েটি মারা যায়। তবু সে মিথ্যা ছলনা ভেঙে দিয়ে কেঁদে বলেছিল –

"আমি মরতে চাইনি, - ভগবানের কাছে রাতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু সব ফুরিয়ে গেল।"[৬]

লেখক জানাচ্ছেন –

"তখন কাল-বৈশাখীর উন্মত্ত মসীবরণ আকাশে নীড় ভাঙার মহোৎসব লেগেছে।"[৭]

'শুধু কেরানী' গল্পটিতে ছেলেটি তার দারিদ্র্যের জন্য স্ত্রীকে ভালো ডাক্তার দেখাতে পারেনি, দেখালে হয়তো বেঁচে যেত তার স্ত্রী এবং তাদের একসঙ্গে বাঁধা স্বপ্ন। কিন্তু দারিদ্র্য ও ভগবানের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাদের স্বপ্ন ভেঙে শেষ হয়ে গেল তবু তারা ভগবানের এই পক্ষপাতিত্বে ক্ষিপ্ত হয়ে অভিশাপ দেয়নি সংসারকে, সব মেনে নিয়েছে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কাছে মিথ্যা ছলনা করেছে একটু সুখে থাকার জন্য, উভয়েই যদিও জানত এ সুখ তাদের ক্ষণস্থায়ী তবুও তারা সুখে থাকার অভিনয় করে গেছে – প্রেমেন্দ্র এই গল্পের মাধ্যমে এই ব্যর্থতা, নৈরাশ্য, পরাজয়ের সংযত কাহিনী তুলে ধরে দেখালেন নিম্ন-মধ্যবিত্তের হৃদয় অরণ্যের ছবি, যেখানে কেউ কাউকে

দোষ দেয় না। মেনে নেয়, মানিয়ে নেয় তবুও বিধাতার পক্ষপাতিত্বে শেষ রক্ষা হয় না। তবুও তারা কাউকে অভিশাপ দেয় না। মেনে নেয়।

'শৃঙ্খল' গল্পটিতে দেখি, বিনতি এবং ভূপতি এদের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যেমন হওয়া উচিৎ তেমন সম্পর্ক তাদের মধ্যে নেই। সাত বছর তারা একসাথে বাস করেছে কিন্তু তার কোন পরিচয় তাদের ব্যবহারে নেই, তাদের মধ্যে যেন-

"অসীম মহাদেশের ব্যবধান"[৮]

রোজ সকালে উঠে ভূপতি নিজেই বাজারে যায়। বাজার থেকে ফিরে মোটটা নামিয়ে দেয় রান্না ঘরে। খাবার পর নিজের ঘরে গিয়ে অফিসে যাবার জন্য তৈরি হয়। তাদের সম্পর্কে মিল না থাকলেও –

"সংসারের কাজ কিন্তু ঠিক নিয়ম মতো সুশৃঙ্খলভাবেই চলিতেছে। কোথাও এতটুকু গোল নাই। বাহির হইতে চেষ্টা করিলেও সেখানে কোন অসংগতি কেহ দেখিতে পাইবে না।"[৯]

তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার শুদ্ধতাটা সেই জন্যই আরও ভয়ঙ্কর। সাধারণ মান-অভিমানের ক্ষণিক পালা নয়, ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে আবদ্ধ এই দুইটি নরনারীর অসাধারণ এই বিমুখতার হেতু তাহাদের অতীত ইতিহাসেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

বিনতির বাবার ভালো ছেলে খোঁজার সামর্থ্য ছিল না, ভূপতিকে কন্যাদান করেছিল ছোট সংসার দেখে এবং উপার্জন ক্ষমতা দেখে। কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছিল ভূপতি একটু কেমন যেন। আর এই কেমন যেনর জন্যই সংসারের গোড়া থেকেই একটু খিটিমিটি বেঁধেছে। কিন্তু তা গাঁয়ে মাখার মতো এমন কিছু হয়তো নয়। কিন্তু –

"তাহার ভিতর স্বামীর ব্যবহারের যে পরিচয় পাইয়াছে তাহা তাহার অনুকূল হইলেও বিনতির মনে কোথাও যেন একটা অহেতুক আশঙ্কা তাহাতে জাগিয়া উঠিয়াছে।"[১০]

একদিন বিনতির শাশুড়ি কাজের ভুল হবার জন্য তাকে বকলে ভূপতি তার মাকে নানারকম ভাবে অপমান করে। তার মায়ের অপমান দেখে বিনতি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা হয়। এমন ঘটনা তাদের সংসারে একটি নয়। যেন –

"সংসারের মসৃণ সানঞ্জস্যকে ভাঙিয়া চুরিয়া বিশৃঙ্খল বিকৃত করিয়া তোলায় ভূপতির যেন অহেতুক একটা আনন্দ আছে। তাহার চেয়েও বেশি – ছোটখাট নিষ্ঠুরতাই যেন তার বিলাস।"[১১]

বিনতি তার স্বামীর ব্যবহারে সর্বদাই একটা অস্বস্থি, একটা নামহীন অস্পষ্ট আতঙ্ক যেন সে অনুভব করে। তার শাশুড়ি মারা যাবার পর যেন এটি আরও বেড়ে যায়। একদিন ভূপতি লক্ষ্য করে বিনতির মাথার চুল উঠে গেছে দেখে সে বলে একটা তেল আনতে হবে। বিনতি না বলা সত্ত্বেও সে আনে একটা ছোট বোতল, যা তেল আছে সেটি একবার দিলেই ফুরিয়ে যাবে। বিনতি যখন জিজ্ঞাসা করে –

"এতো ছোট শিশি যে, এতো একবার মাখলেই ফুরিয়ে যাবে।"[১২]

ভূপতি সেকথার উত্তর একটু হেসে বলে –

"ওটা মাথার নয়, কপালে লাগাবার জন্য, পড়ে দেখো না – পোড়া ঘায়ে ধন্বন্তরি বলে লিখেছে।"[১৩]

বিনতির সন্তান হবার সময় যখন সে হাসপাতালে ছিল, সে মৃত সন্তান প্রসব করেছিল, অনেক কষ্ট করে বিনতিকে বাঁচানো গেছে। যখন ডাক্তার ভূপতিকে বলে, তখন ভূপতি অদ্ভুত ভাবে ডাক্তারকে বলে –

"আপনাকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ।"[১৪]

একদিন ভূপতি সিনেমার টিকিট কেটে নিয়ে আসে। বিনতি দেখে অবাক হয়ে যায়। যে স্বামী কোনদিন তাকে ডাক্তার দেখানো ছাড়া বাইরে নিয়ে যায়নি সে হঠাৎ সিনেমার টিকিট এনেছে। সিনেমা হল অনেক দূরে তাদের বাড়ি থেকে। সিনেমা দেখতে গিয়ে মাঝপথে ভূপতি বিনতিকে ফেলে চলে এসে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ট্যাক্সি চালাতে বলে। তখনই বিনতি এসে পড়ে। ভূপতি তখন বলে –

"এসো ঠিক সময়ে এসে পড়েছ।"[১৫]

বিনতি ভেতরে উঠে বলে –

"হ্যাঁ তোমাকে বেরুতে দেখলাম যে।"[১৬]

কিছুক্ষণ আর কথা বলে না, বিনতি হঠাৎ বলল –

"তুমি এমন খারাপ কাজ করবে ভাবিনি।"[১৭]

ভূপতি বলে –

"না ভেবেছিলাম, মনের ঘেন্নার তুমি তো নাও ফিরতে পারো, সেইটির ওপর জোর দিয়েই যা ভুল করেছিলাম।"[১৮]

'মনের ঘেন্নায় মানুষ কি করতে পারে, কেউ জানে কি?' – বিনতির এই শেষ কথা। এরপর মৃত্যুর মতো নিঃশব্দতা তাদের সমস্ত সংসারকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। অন্যান্য কথা হয়তো তারা এবার বলবে সংসারের প্রয়োজনে, পরস্পরকে আহত করবার অদম্য প্রেরণায়, কিন্তু –

"তবু অন্তরের ও নিঃশব্দতার ভার ঘুচিবার নয়।"[১৯]

মনের অভিমানে, রাগে বিনতি দিন দিন ভূপতির প্রতি বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। আর সেই শৃঙ্খলতায় দুজনেই আটকা। জীবনের একটিমাত্র বিলাস চরিতার্থ করবার জন্যই নিঃশব্দতার নির্বাসন তাদের নিঃসঙ্গ আত্মা স্বেচ্ছায়ই বরণ করে নিয়েছে। তাই তারা পরস্পরকে ছাড়তে পারবে না কারণ-

"প্রেমে নয়, তাহার চেয়ে তীব্র, তাহার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তাহারা আবদ্ধ।"[২০]

সেই বিতৃষ্ণার শৃঙ্খল তারা ছিঁড়লে আর বাঁচবার সম্বল তাদের থাকবে না। তাই তারা পরস্পরের জন্য বেঁচে থাকতে চায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'শৃঙ্খল' শব্দের অর্থ 'বেড়ি' – অর্থাৎ - বেঁধে রাখার উপকরণ। ভূপতি এবং বিনতির সম্পর্কের বেড়ি বা বেঁধে রাখার উপকরণ একে অপরের প্রতি ভালোবাসা নয়, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার বাঁধনে আটকা তারা। সেই বাঁধন কাটলে তাদের বেঁচে থাকা দায় হয়ে যাবে। কারণ বিনতি তার বাপ মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারবে না। তাই তাকে ভূপতির সমস্ত উন্মাদনা সহ্য করে থাকতে হবে। তাই তারা গভীর বিদ্বেষ এবং বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে একে অন্যের জন্য বেঁচে থাকতে চায়। একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণা তাদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখেছে। তাই চাইলেও – সে বেড়ি কাটার ক্ষমতা নেই তাদের।

গল্পটিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র মধ্যবিত্তের মানসিকতায় বিপর্যস্ত উন্মাদনা সহ্য করে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও একসঙ্গে থাকা যায় বছরের পর বছর সে সকল দম্পতি তাদের হৃদয় অরণ্যের অন্ধকারময় দিকের ছবি তুলে ধরেছেন।

'হয়তো' গল্পে মধ্যবিত্তের বিপর্যস্ত মূল্যবোধ তথা ঘৃণ্য অবিশ্বাস ও সংশয়ে দুচ্ছেদ্য জটিলতা কীভাবে বিষময় করে তুলেছে জীবনকে তার বর্ণনা রয়েছে। 'হয়তো' গল্প পাঠে জানা যায় – মহিম অদ্ভুত বিকৃত স্বভাবী পুরুষ। জীর্ণ সাতমহলা বাড়িতে লাবণ্যের সঙ্গে শুরু হয় তার দাম্পত্য জীবন। কিন্তু সাতপুরুষ ধরে এ বাড়ির পুরুষেরা মেয়েদের উপরে যে অত্যাচার লাঞ্ছনা করেছে তার পাপ এ বাড়িতে বিষাক্ত করে তুলেছে। মহিমের মধ্যবিত্ত সত্তা তাই দ্বিধা বিভক্ত। একদিকে সে স্ত্রীকে ভালোবাসতে চায় অন্যদিকে সেই ভালোবাসা ঘৃণ্য রূপ হয়ে যায়। একদিন মহিম সেই বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসে লাবণ্যকে নিয়ে এবং বলে –

> "তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি লাবণ্য; এতদিনের ব্যবহারে আমায় মনে মনে ঘৃণা করতে শুরু করেছ কিনা তাও জানিনা; কিন্তু একটি কথা বুঝে আজ ক্ষমা করতে অনুরোধ করছি লাবণ্য। ও বাড়ির হাওয়া পর্যন্ত বিষাক্ত এইটুকু জেনে তুমি আমায় মার্জনা করতে পারবে নাকি কখনো?"[২১]

স্ত্রীকে এত হতাশার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে মহিম আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখায় লাবণ্যকে, বলে -

> "আবার আমরা সহজ মানুষের মতো সংসার আরম্ভ করতে পারি না কি লাবণ্য? সাতপুরুষের পাপ দেহ থেকে ধুয়ে ফেলে আবার নতুন জন্ম পাওয়া যায় না কি..... তুমি জান না লাবণ্য, কত বাধা, রক্তের ভেতর কত বিষ জমে আছে! কিন্তু এ বিষ থেকে আমি মুক্ত হবই, শুধু যদি তোমার ভালোবাসা পাই।"[২২]

এতো আশ্বাস দেওয়ার পর মহিমের হৃদয়ে অরণ্যের অন্ধকার সত্তার আবার জাগরণ হয় তাইতো ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অপরিচিত স্থানে গাড়ি থেকে নেমে, একটি নদীর ধারে এসে পোল পাড় হতে বলে লাবণ্যকে এবং ঠেলে ফেলে দেয় এবং ঠেলে ফেলার আগে বলে –

> "কি বিশ্বাস নারীকে করা যায়? কি তাহার প্রেমের মূল্য? আজ যে ভালোবাসিয়াছে কাল বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার কতক্ষণ ! তাহার চেয়ে এই মধুরতম মুহূর্তটিকে চিরন্তন করিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যা না কি? এই সন্দেহের দোলা হইতে চিরদিনের মতো রক্ষা পাইয়া তাহার ক্লান্ত মন যে তাহা হইলে পরম

বিশ্রাম লাভ করিতে পারে! ভালোবাসা জীবনে যদি আপনাকে অপমানই করে তখন তাহাকে মৃত্যুর মধ্যে অমর করিয়া রাখিলে ক্ষতি?"[২৩]

অর্থাৎ, গল্পটিতে দেখা যায় মহিমের অসুস্থ মানসিকতা যার কবলে পরে লাবণ্যের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে লাবণ্যের প্রতি তার নানান পরিহাস নানান শক্তি তারপরে আবার নতুন জীবনের স্বপ্নে দেখানো এবং শেষে তাকে পোলের থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া সবই সমাজে মহিমের মতো মানুষের হৃদয়ে যে অসুস্থ মানুষ বাস করে যার উন্মাদনায় তার আপনজনের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার তেমনই জীবনের গল্প এটি।

'তেলেপোতা আবিষ্কার' গল্পটিতে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, মধ্যবিত্ত অসুস্থ চিন্তার ছবি দেখতে পাই। কলকাতার এক যুবক তার এক বন্ধুর সঙ্গে এক অজানা গ্রামে আসে অনেক কষ্ট করে সেখানে এক অন্ধ মৃত্যুপথ যাত্রিণীর কাছে তার বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার মেয়েকে বিবাহের প্রতিজ্ঞা করে কারণ অনেক বছর আগে নিরঞ্জন বলে এক যুবক তার মেয়ে যামিনীকে বিয়ে করার আশ্বাস দিয়েছিল সেই নিরঞ্জনের ফিরে আসার জন্য সেই অন্ধ বৃদ্ধা বেঁচে আছে। সেই কলকাতার যুবকটিকে সেই বৃদ্ধা নিরঞ্জন ভাবলে কলকাতার যুবকটি মিথ্যা বলে যে সেই নিরঞ্জন। বৃদ্ধা ভাবে সত্যিই সে নিরঞ্জন তার মেয়েকে বিবাহ করবে, কিন্তু তার মেয়ে তো জানে সে নিরঞ্জন না। কিন্তু সেই যুবকটিও নিরঞ্জনের মতো যামিনীকে বিবাহের আশ্বাস দিয়ে সেই মুহূর্তে অনেক স্বপ্ন দেখায় তাকে। কিন্তু সে কলকাতায় ফিরে গিয়ে যামিনীকে ভুলে যায় ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এবং সেরে উঠেও সে আর সেই গ্রামে ফিরে যায় না। গল্পটির মাধ্যমে প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখাতে চেয়েছেন যে শহরের মানুষের হৃদয়ে অনেক ঘটনা ঘটে এমন এবং তারা জায়গা বিশেষে ভালোলাগার বশবর্তী হয়ে নানান প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে তাদের হৃদয় অরণ্যের অন্ধকারে সেই ছোট ছোট ঘটনা বিন্দুর মতো হারিয়ে যায়।

'সংসার সীমান্তে' গল্প পাঠে আমরা দেখি বিশ্রী বাদলের রাতে রজনী নিজের প্রত্যেকদিনের অভ্যাসবশতই ক্লান্ত হতাশ চোখে পথের দিকে প্রতীক্ষায় বসে আছে। লেখক তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন –

"বৃষ্টির ঝাপটা হইতে সযত্নে দুই হাতে কেরোসিনের ধূমবহুল শিখাটিকে যে আড়াল করিয়া বসিয়া আছে তাহার দুরাশার বুঝি আর অন্ত নাই। কিংবা হয়তো হতাশার শেষ সীমায় সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার মৃত মনের কাছে বাহিরের দুর্যোগের কোন অর্থই আর নাই।"[২৪]

সেই বৃষ্টির রাতে অঘোর নামে একজন লোক তার কাছে আশ্রয় নেয় এবং রজনীকে এক টাকা দেয় এবং সেই টাকা আবার নিয়ে সকাল হওয়ার আগেই সে চলে যায়। দ্বিতীয়বার আর সে আসে এবং অনেক হাঙ্গামার পর সে রজনীর কাছে বেশ কিছুদিন থাকে। একসময় দুজনে দুজনকে ভালোবেসে ফেলে। রজনী পতিতা আর অঘোর পেশায় চোর। দুজনে আবার নতুন করে বাঁচতে চায়। রজনীর কথায় অঘোর চুরি ছেড়ে রজনীকে নিয়ে দিল্লি আগ্রাই যাবে ঠিক করে। কিন্তু রজনীর দেনা শোধ করবার জন্য অঘোর শেষবারের মতন একবার চুরি

করবে তারপর সব ছেড়ে চলে যাবে দূরে রজনীর গা ছুঁয়ে সে বলে। অঘোর তাদের নতুন সংসারের জন্য অনেক জিনিসপত্র কিনে আনে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখে। এপ্রসঙ্গে লেখক জানাচ্ছেন –

"গ্লানির প্রগাঢ় অন্ধকারে যাহাদের অতীত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বর্তমানে যাহাদের ক্লেদপঙ্কিল, তাহারাও ঘর বাঁধিতে চায়, পৃথিবীর ভাগ্যবান নর-নারীদের জীবনলীলার অনুকরণ করিতে তাহাদেরও সাধ যায়।"[২৫]

ভাবী সংসার সম্পর্কে অঘোর রজনীকে অনেক কথাবার্তা স্বপ্ন দেখা হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। এবং ভোরের গাড়িতে কলকাতায় রওনা হবে তার আগে সে শেষবারের মতো চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় এবং ৫ বছরের জেল হয়। অনেক কান্নাকাটি করেও কোন লাভ হয়নি। সে যে এই পথ ছেড়ে নূতন ভাবে বাঁচতে চায় সে কথা বিচারক বিশ্বাস করেনি। ফলত তাদের স্বপ্ন ভেঙে যায়, নতুন করে বাঁচার সুযোগ তারা পেল না। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে অঘোর জেলে আর রজনী অঘোরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

অর্থাৎ গল্পটিতে সমাজের নিম্নশ্রেণির দুই নর-নারীর মধ্যেও যে প্রেম হয় তারা যে একে অপরের অবলম্বন হয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে এ সুযোগে সমাজের উপরতলার মানুষেরা দেয় না। তাদের হৃদয়ের দিকে অন্যরা দেখে না, তাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগা নিয়ে কারোর মাথাব্যথা নেই, তাইতো 'এবার জেল হইলে তাহার সর্বনাশ হয়ে যাবে।' অঘোর বিচারককে একথা জানালেও বিচারক শাস্তি কম করে একটা সুযোগ দেবে ভেবেছিল, কিন্তু তিনিও ভুলে যায়। ফলত দুটো জীবন নষ্ট হয়ে যায়, তাদের স্বপ্নগুলো মোরে যায়। তাদের আবেগ, অনুভূতির দরজা দিয়ে আলো প্রবেশ করলেও বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাসে তা আবার বন্ধ হয়ে যায়। নতুন করে বাঁচা আর হয় না তাদের একসঙ্গে। তাদের হৃদয় অরণ্যের রহস্য অন্য কারো পক্ষে জানা হয় না। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাদের অনুভূতিকে বুঝেছিলেন বলেই এই গল্পে সমাজের আরও অনেক অঘোর এবং রজনীর প্রতি সম্মান এবং সমবেদনা জানিয়েছেন।

'পুন্নাম' গল্পটিতে গল্পকার পৌরাণিক প্রসঙ্গকে রূপক বা প্রতীকের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'পুন্নাম'-এর অর্থ নরক অর্থাৎ গল্পটিতে নরকের প্রতি ইঙ্গিত দর্শিত হয়েছে। যেখানে পুত্রের মধ্যে অমানসিক, অমানবিক ছায়া দেখে কষ্ট পায় ললিত এবং তার মৃত্যুর পর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নরকের দরজা খুলে দেবে এই ভেবে সে উন্মত্তের মতো আর্তনাদ করে।গল্পে রয়েছে নির্মম নিয়তির বিরুদ্ধে জুয়াচুরি করে মৃতপ্রায় একমাত্র ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলে, পরে বিবেক দংশনের ছবি। ললিতের সংসার চলে কষ্ট করে একমাত্র ছেলে সে রোগে ভুগে মৃতপ্রায়। ডাক্তার বলেন হাওয়া বদল করতে হবে। ললিত সে জন্য চুরি করে টাকা জোগার করে বৌ ছবি ও ছেলেকে চেঞ্জে নিয়ে যায়। ছেলে ভালো হয়ে যায়। কিন্তু ছেলের স্বার্থপর মনোভাব দিন দিন কদর্যভাব ধারণ করে। এবং যার ফল স্বরূপ প্রতিবেশী শিশু টুনুর উপর তার অত্যাচার চলে নির্মমভাবে। গল্প শেষে দেখা যায় টুনু রোগে ভুগে মারা যায়। আর বেঁচে যায় স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ ছেলে। প্রতিবেশী শিশু টুনু সহজ, সরল, মিষ্টি একটা বাচ্চা, তার সে বাচ্চা নয়, সে একজন ভালো নাগরিক হতে পারত। সমাজে টুনুর মতন শিশুর প্রয়োজন, অথচ

সে মরে গেল। অন্যদিকে তার ছেলে নীচুমনা, স্বার্থপর, তার মতন ছেলে সমাজ চায় না, অথচ তাকে লালিত জুয়া চুরি করে বাঁচিয়ে তুলেছে এবং সমাজে একটা বিকৃত মানুষ সে বাঁচিয়ে তুলেছে এই বিবেক দংশন হতে থাকে ললিতের। তাই সে বলে স্ত্রী ছবিকে –

"টুনু মরে গেলে আর আমাদের ছেলে বেঁচে উঠল – আশ্চর্য নয় ছবি।"[২৬]

ললিত আবার ক্ষোভে, বিবেক দংশনে বলে ওঠে –

"আমরা অনেক ত্যাগ করেছি, অনেক সয়েছি, আমাদের ছেলে বাঁচবেই যে ছবি ! আমাদের ছেলের মতো আরো কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে বড় হবে, রেষারেষি, মারামারি, কাটা-কাটি করে পৃথিবীকে সরগরম করে রাখবে, নইলে আমাদের এত চেষ্টা এত কষ্ট স্বীকার যে বৃথা ছবি!"[২৭]

অর্থাৎ 'পুন্নাম' গল্পটিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র একদিকে দারিদ্রতাড়িত অসহায় পিতা নিরুপায় হয়ে জুয়াচুরি করতে বাধ্য হয় ছেলেকে বাঁচানোর জন্য, ছেলে বেঁচেও যায়, কিন্তু সেই বাঁচা ললিতকে চিরকাল ধরে খোঁচা দেবে, ললিতের মতো দু-একজন সমাজে থাকে যাদের হৃদয় অরণ্যে অন্ধকার আলো অর্থাৎ ভালো খারাপ মিশিয়ে থাকে। সময়ে সময়ে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল হয়ে ওঠে আবার সময়ে সময়ে সেই বোধ বিসর্জন দিতে হয় তাদের। কিন্তু শেষমেশ তাদের আত্মমর্যাদা বোধ-ই জয়ী হয় আর তাদের মধ্যে বিবেক দংশন তীব্র হয়ে ওঠে। সেই সকল নিম্ন-মধ্যবিত্তের হৃদয়ের রহস্যই তুলে ধরেছেন 'পুন্নাম'- গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র।

আলোচ্য গল্পগুলিতে এভাবেই প্রেমেন্দ্র মিত্র হৃদয় অরণ্যের রহস্য উন্মোচন করেছেন। কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র মানুষের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে তাদের আবেগ, অনুভূতি, ভালোলাগা, মন্দ লাগা, সমস্ত গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন এবং সমাজের সেই সকল নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের প্রতি সমবেদনা জাগাতে তাদের ছবিগুলি তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। যা সমকালের মানুষের ছবিই চিত্রিত হয়েছে।

মানুষের মনের অরণ্য আসল অরণ্যকেও ছাড়িয়ে যায়, এই সত্যটি প্রেমেন্দ্র মিত্র গভীরভাবে বুঝেছিলেন। অরণ্যের গভীরে যেমন অন্ধকার থাকে, মানুষের হৃদয় অরণ্যেও তেমনই অন্ধকার থাকে। আসল অরণ্যে যেমন চন্দ্র সূর্যের আলোয় তাদের ছবির পরিবর্তন হয়, তেমনি নিম্ন-মধ্যবিত্তের মানুষের হৃদয় অরণ্যেও তেমনি সত্য ও মিথ্যা, ভালো-মন্দের আলোয় তাদের হৃদয় অরণ্যের ছবিও পরিবর্তন আনে। সেখানে কখনও কখনও সত্য জয় হয়, কখনও আত্মমর্যাদার আলো পড়ে। ফলত এই দুই দ্বিধার দ্বন্দ্বে মানুষ কখনো হিংস্র হয়ে ওঠে, কখনো বা আত্মগ্লানি অনুভব করে বিবেক দংশনে উন্মত্ত হয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। এই বিষয়গুলি গল্পে তুলে ধরে প্রেমেন্দ্র মিত্র মানুষের হৃদয় অরণ্যের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, সে বিষয়টি আমরা আমাদের প্রবন্ধে নির্বাচিত গল্পগুলিতে আলোচনা করেছি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর সাহিত্য কর্মের ঊষালগ্ন থেকে মানবকুলকে ভালোমন্দ স্পষ্ট করে বললে অস্থিমেদ-মজ্জা সহ উপলব্ধি করেছেন আর তাই তিনি মানুষের হৃদয় অরণ্যের রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছেন সহজেই। একটি চিঠিতে তাই তিনি বলতে পেরেছেন –

'দুঃখও দেখেছি বটে, দেখেছি কদর্যতা
মার চোখের জল দেখেছি, গলিত কুষ্ঠ দেখেছি,
দেখেছি লোভের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের ভীরুতা,
লালসার জঘন্য বীভৎসতা, নারীর ব্যভিচার, মানুষের
হিংসা, কদৎকার অহংকার, উন্মাদ বিকলঙ্গ, রুগ্ন
গলিত শব।'

মানুষের হৃদয়কে গভীরভাবে যাপন না করলে এত কিছু অনুভব করা যায় না তা আমাদের সকলেরই অনুমেয়। আর প্রেমেন্দ্র মিত্র মানুষের হৃদয়কে যাপন করেছেন বলেই তাঁর গল্পগুলির চরিত্ররা মুখ পেয়েছে। এবং তাদের হৃদয় অরণ্যের রহস্যও উন্মোচন করতে সফল হয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১। 'দেবতার জন্ম হল', 'প্রথমা', প্রেমেন্দ্র মিত্র
২। 'মানুষের মানে চাই'- প্রেমেন্দ্র মিত্র
৩। মুখোপাধ্যায় অরুণ, কালের পুত্তলিকা, পৃ. ২৪৮
৪। **গল্পপাঠ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প: শুধু কেরানী**, https://www.galpopath.com > blog
৫। তদেব
৬। তদেব
৭। তদেব
৮। **সিকদার অশ্রুকুমার সম্পা, বাংলা গল্প সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, , কবিতা সিংহ, সাহিত্যঅকাদেমি, অষ্টম মুদ্রণ: ২০১৯, পৃ. ১১২**
৯। তদেব, পৃ. ১১২
১০। তদেব, পৃ. ১১৪
১১। তদেব, পৃ.১১৫
১২। তদেব, পৃ.১১৭
১৩। তদেব, পৃ.১১৭
১৪। তদেব, পৃ.১১৯
১৫-১৮। তদেব, পৃ.১২১
১৯-২০। তদেব, পৃ.১২২
২১। মিত্র প্রেমেন্দ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, নাভানা, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩, প্রথম মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৫৯ , **হয়তো, পৃ. ৫৮**

২২। তদেব, পৃ.৫৯
২৩। তদেব, পৃ.৬০
২৪। তদেব, পৃ.১০৪
২৫। তদেব, পৃ.১১৮
২৬-২৭। তদেব, পৃ.১৩